# ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি

**সানজিদা মুস্তাফিজ**

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookSanjida

১৯৪৭ সালে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য থেকেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বিকশিত বাঙালি জাতি ১৯৪৭-এর পর বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করা এবং বাঙালি জাতীয় চেতনা তৈরির মাধ্যমে 'আত্মনির্ধারণ অধিকার' চর্চার দিকে তথা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের আয়ত্তে থাকা একটি বিধান। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, রাষ্ট্র জাতীয় ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখা ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। সময়ের সাথে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বিষয়ক আইন প্রণয়নের উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ বা সংস্কার দীর্ঘদিন গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে বাংলাভাষা ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও আবশ্যক। আইনগত ভিত্তিতে ভাষা আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠেছিল এবং সে প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল তা আইনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে বাংলা ভাষার সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তা কতটা কার্যকর ছিল সে বিষয়েও উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি মানবাধিকারের দৃষ্টিতে আইনের ইতিহাসের অংশ হিসেবে কীভাবে মূল্যায়ন করা যায় সেদিকটিও প্রবন্ধটিতে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ ও নতুন আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভাষার প্রয়োগাধিকারে আইনের প্রয়োগ ও প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে এবং ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বলে উক্ত গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারিত হয়েছে।

**গবেষণা-পদ্ধতি**

গবেষণাটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-নির্ভর একটি গবেষণা। উক্ত গবেষণার প্রেক্ষাপট হলো ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি এবং ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ কীভাবে তৈরি হয়েছে তার বিশ্লেষণ করা। এছাড়া সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে বা নিরসনে আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ ও তার প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা। এ গবেষণার ক্ষেত্রে 'গুণগত পদ্ধতি'র প্রয়োগ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় প্রাথমিক ও অনেক ক্ষেত্রে গৌণ উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের সাথে গবেষণার সার্বিক কাঠামো নির্ধারণ, তথ্য বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে মাধ্যমিক উৎসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতিবেদন, গ্রন্থ,

প্রবন্ধ, সংবাদপত্র-পত্রিকা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে তথ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তথ্যের সময়কাল, প্রাপ্তিস্থান, তথ্যসূত্রের যোগানদাতা, কী ধরনের প্রেক্ষাপটে তথ্যসূত্রের আবির্ভাব হয়েছে; সে-সাথে এসব তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া হয়েছে (Shafer, 1974, p. 19.)। গৌণ উৎস ব্যবহারে কিছু ক্ষেত্রে তথ্যবিভ্রাট ঘটে, তাই সে ধরনের প্রেক্ষাপটে গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যগুলোকে অন্য তথ্যের সাথে যাচাই করে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া অপূর্ণাঙ্গ তথ্যসূত্র, অনুমানভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততার বিষয় হতে গবেষণাটিকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

**সাহিত্য পর্যালোচনা**

ভাষা আন্দোলনের সার্বিক বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা এবং অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গবেষক গোলাম কুদ্দুস *ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন* নামের ৭০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে ১৯টি অধ্যায়ের মাধ্যমে শতাব্দী-প্রাচীন আমাদের ভাষার লড়াইকে তুলে এনেছেন। যেখানে তিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ও ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ইতিহাসের একাধিক অমীমাংসিত সত্যকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় তুলে এনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেখানে তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হওয়া দেখিয়েছেন প্রাচীনকালে আরাকান শাসনামলে। তিনি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে মাথার খুলি উড়ে মগজ বেরিয়ে যাওয়া যুবকের নাম বলেছেন সালাউদ্দিন, যাকে তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ বলেছেন। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা এবং ১৯৪৮ সালে সংগঠিত ভাষা আন্দোলনের প্রথমপর্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি যথাযথভাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন (কুদ্দুস, ২০১৫, পৃ. ৮)। ভাষাসৈনিকদের অনেকেই সে-সময় কারাবরণ করেছিলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন বহু ছাত্র ও যুবনেতা। তাদের কারাগারের স্মৃতি নিয়ে ফজলুল করিম লিখেছেন *বায়ান্নর কারাগার* (করিম, ২০১৪, পৃ. ১৫-১৮)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঘটনা প্রবাহ ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ* গ্রন্থে এম. এ. বার্ণিক উল্লেখ করেছেন ভাষা আন্দোলনের পূর্বে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিভিন্ন উদ্যোগ, আন্দোলনের স্তিমিত বিভিন্ন ঘটনা, বিস্ফোরণকাল এবং আন্দোলন-উত্তর গঠনমূলক বিভিন্ন বিষয়সমূহ (বার্ণিক, ২০০৫, পৃ. ৮-৯)। *মোস্তফা কামালের ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন* গ্রন্থে ১৯০০ সালের শুরু হতে এ অঞ্চলে ভাষার ক্ষেত্রে কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা তুলে ধরেছেন। সে-সাথে তিনি ভাষা আন্দোলনকে ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৫২ এ দুটি পর্বে ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন (কামাল, ১৯৮৭)। বদরুদ্দীন উমর-এর *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল* (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও গণ সংগঠনের সাংগঠনিক ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, প্রস্তাব, ভাষণ, ইশতাহার, সার্কুলার, মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলপত্র, এলিস কমিশন রিপোর্ট ও তাজউদ্দীন আহমেদের ডায়রির কিছু অংশ এখানে আলোচিত হয়েছে (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ৭-১২)। *বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বাঙালির সংগ্রাম* গ্রন্থে নিগার চৌধুরী দেখানোর চেষ্টা করেছেন, ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হতে শুরু করে ভাষা আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনাপ্রবাহ। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন বায়ান্নর রক্তাক্ত রাজপথ ও বিদ্রোহী গণপরিষদের ঘটনাসমূহ (চৌধুরী, পৃ.১-৬)। সন্তোষ গুপ্ত তাঁর *একুশের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ* গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি হতে কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে বাঙালি এগিয়ে যায়। সে-সাথে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কীভাবে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তিনি আরও বলার চেষ্টা করেছেন, উনিশ শতকে রেনেসাঁর যে ভূমিকা ছিল রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিতে; তৎকালীন পূর্ববাংলার রাজনীতিতে সে ভূমিকা রেখেছিল ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষা সর্বক্ষেত্রে

প্রচলনে কী কী বাধার সম্মুখীন হতে হয় সেটাও দেখানোর চেষ্টা করেছেন (গুপ্ত, ২০০৫, পৃ.৪-৬)। *ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ দুই বাংলার চালচিত্র* গ্রন্থে ড. জাকিরুল হক ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (হক, ২০১৪, পৃ. ১১-১২)।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* গ্রন্থে সকল ভাষার মর্যাদা সমান-সহ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সামনে চলার অনুপ্রেরণা কীভাবে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা হতে পাওয়া যায়, তা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া, পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির ভাষার সমান অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে সকল জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে (রহমান, ২০১৬, পৃ. ২৬)। অন্যদিকে ইসমাইল হোসেন বকুল সম্পাদিত *ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, রক্তঝরা একুশ* বইয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, এ আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা, আন্দোলনের ধরন, বিস্তার, ব্যস্ত ঘটনাবলির বিবরণ তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে (হোসেন, ২০০০, পৃ. ৭)। এছাড়া বশীর আল্ হেলাল তাঁর *ভাষা-আন্দোলনের সেই মোহনায়* গ্রন্থে ভাষা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেখা যায়। তিনি ভাষা আন্দোলনকে শোষিত আর শোষকের মধ্যকার আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সে-সাথে ভাষা আন্দোলনে আমাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আত্মবিকাশের পথ কতটা উত্তাল ছিল তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন (হেলাল, ২০০৩, পৃ. ৭-৮)। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত *একুশে নির্বাচিত প্রবন্ধ* গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধ-লেখক তাদের প্রবন্ধের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, বর্তমান সমাজ-রাজনীতির ওপর ভাষা আন্দোলনের প্রভাব এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়সমূহ তুলে ধরেছেন (সরকার, ২০১৯ পৃ. ৭-৮)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* গ্রন্থে বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে এ দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং করছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ৭-১২)। আতিউর রহমান ও লেনিন-এর লেখা *ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার* বইয়ে ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক কাঠামো তুলে ধরেছেন। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রকাশনার পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে ওঠার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন (রহমান, আজাদ, ১৯৯৫, পৃ. ৭-৯)। উল্লিখিত কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি সংক্রান্ত কোনো রচনা নেই। যে কারণে আলোচ্য গবেষণার যৌক্তিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

**ঘটনাপ্রবাহ**

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ হরতালের মধ্য দিয়ে রাজপথে ভাষা আন্দোলন সূচিত হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা আন্দোলন সূচিত হয়েছিল ১৯৪৭ সাল থেকেই। ভারত-পাকিস্তান বিভাজন যখন আসন্ন, তখন ১৭ই মে ১৯৪৭-এ হায়দ্রাবাদে উর্দু সম্মেলন হয়; যেখানে মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করেন। বাঙালি লেখক আবদুল হক এর প্রতিবাদে দৈনিক *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় ২২ এবং ২৯শে জুন এক প্রবন্ধ লিখেন 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব: ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব'। উর্দুভাষা যে মুসলমানের ভাষা, ইসলামি ভাষা– এমন একটি অযৌক্তিক ধারণা থেকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুলাই মন্তব্য করেছিলেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তিনি মনে করেছিলেন পাকিস্তান হবে মুসলমানের ইসলামি রাষ্ট্র। উর্দু ছিল মাত্র ৬.০৭ শতাংশ নাগরিকের মাতৃভাষা। একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা আর সেদিক থেকে বাংলা ভাষার দাবি অগ্রগণ্য ছিল। এ লেখার প্রতিবাদে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ *আজাদ* পত্রিকায় ২৯শে জুলাই এক প্রবন্ধ লিখেন

'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে। যেখানে তিনি শতকরা ৫৫ শতাংশ পাকিস্তানি নাগরিকের ভাষা 'বাংলা' রাষ্ট্রভাষা হবে এমন যুক্তি উপস্থাপন করেন (হোসেন, ২০২৪, পৃ. ১-২)।

১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে কামরুদ্দীন আহমদ প্রধানত ভাষা প্রসঙ্গে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন 'গণ আজাদী লীগ'। পুলিশি তৎপরতায় এর বিকাশ না হয়ে নাম হয় 'সিভিল লিবার্টিজ'। কমিউনিস্ট নেতা ভাষা মতিন এ-সময় প্রতিষ্ঠা করেন 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। পূর্ব-বাংলার ছাত্র-জনতা, বুদ্ধিজীবীগণ দাবি করেছিলেন দুটি বিষয়ে। একটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি দাপ্তরিক কাজে রাষ্ট্রভাষা হতে হবে বাংলা এবং উর্দু। 'তমদ্দুন মজলিশ' নামক সংগঠনটি ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ দুটি দাবির পক্ষে আবুল কাশেমের নেতৃত্বে প্রথম আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ই আগস্ট কলকাতার সাপ্তাহিক *মিল্লাত* পত্রিকার সম্পাদকের সাথে বলেছিলেন, বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কারণ, বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর বাংলা ভাষার দাবিতে একটি মিছিল পূর্ব-পাকিস্তান মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'-এ গিয়ে একটি সভায় যোগ দিয়েছিল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট 'গণপরিষদে' ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি শুধু উর্দু ও ইংরেজিতে সংসদ সদস্যদের বক্তব্য দেওয়ার আহ্বান জানানো হলে কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে এ প্রস্তাবের সংশোধনী এনে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলার চেষ্টা করেন, ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে 'উর্দু' রাষ্ট্রভাষা হবে এটাই স্বাভাবিক। সে-সময় খাজা নাজিমুদ্দিন মিথ্যে বলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চায়। পূর্ব-পাকিস্তানে এর প্রতিবাদে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয় এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারি নগরব্যাপী মিছিল হয়। গণপরিষদের ভাষার তালিকা হতে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা ব্যবহার না করা এবং নৌ-বাহিনীর চাকরির পরীক্ষায় বাংলা বাদ দিয়ে শুধু উর্দুকে মাধ্যম হিসেবে রাখার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। মিছিলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান তোলে ছাত্ররা এবং অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। যার প্রতিবাদে ১৪ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৫ই মার্চ সারা পূর্ব-বাংলায় ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সেদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে 'এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর করে বাংলাকে এ প্রদেশের সরকারি ভাষা করা হবে বলে মেনে নেন। সেদিন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যাদের গ্রেপ্তার করেছিলেন, তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। গভর্নর-জেনারেল মোহাম্ম আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ১৯৪৮ সালের ২১ ও ২৪শে মার্চ দাম্ভিক উক্তি করেছিলেন যে, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন নূরুল আমীন। ১৯৫২ সালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ২৭শে জানুয়ারি করাচি হতে ঢাকা এসে পল্টন ময়দানের সমাবেশে আবার উল্লেখ করেন, ''উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'' যার প্রতিবাদে ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১শে জানুয়ারি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দলের নেতাদের সভা হয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দল, ছাত্র-সংগঠন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-হল, পূর্ববঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৮)। ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভা হতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার। যদিও পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক

পরিষদের নির্বাচন এ অজুহাতে পালিত হতে পারে বলে কেউ কেউ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে আগ্রহী ছিলেন না। রাতে নবাবপুরে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় ১১-৪ ভোটে সিদ্ধান্ত হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে না। এ সংবাদ ছাত্রী-হোস্টেলে পৌঁছালে ছাত্রীদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। তবে সলিমুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত দু'টি সভা হতে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। এমনকি ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টায় ১১ জন ছাত্রনেতা ঢাকা হলের পুকুরের পূর্বধারের সিঁড়িতে এক জরুরি গোপন বৈঠকে বসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন (একুশ, ২০১০, পৃ. ৩৩)। তবে শেষে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে।

**ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি**

একমাত্র ভাষানির্ভর নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী চেতনাই পারে গণতন্ত্রকে বিকশিত করে মানুষের অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা নিয়ে আন্দোলন শুধু বাঙালির নয়, সারা বিশ্বের প্রতিটি জাতির মাতৃভাষার মর্যাদা, স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মানুষের মতো বাঁচার দাবির সংগ্রামের দুর্জয় অনুপ্রেরণা তৈরি করেছে। জাতি হিসেবে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সমন্বয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করেছি। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বেশ কিছু আইনগত ভিত্তি ছিল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদে বাংলাকে উর্দুর সাথে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যা আইনগত অধিকারের একটি অর্জন ছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি বর্তমানে আমাদের 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' যা জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত। সারা বিশ্বে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র ক্ষমতা' নীতিটি সকল গণতান্ত্রিক সংবিধানে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act) যা দ্বারা ভারত ও পাকিস্তান পরিচালিত হয়ে আসছিল। এ আইনে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্ধারণের বিধান ছিল। যেহেতু সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ জনগণের ভাষা বাংলাকে নিয়ে আন্দোলন করার অর্থ দাঁড়ায় এ আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক ও আইনি বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যকর ১৯৭২ সালের সংবিধানে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনের ২৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় জাতীয় ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে।

১৯৪৮ সালে জিন্নাহ যখন ঢাকায় এসে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর স্বপক্ষে বলেন, তখন সেখানে লঘিষ্টের ভাষা গরিষ্ঠের ওপর চাপিয়ে দিয়ে প্রভুত্ব বিস্তারের সুপ্ত বাসনা প্রদর্শন করেন। যা ছিল পাকিস্তানি মানসিকতার প্রতিফলন আর এ মানসিকতা পাকিস্তান '৭১ সাল পর্যন্ত ধারণ করেছিল। অর্থাৎ জিন্নাহ লঘিষ্ঠের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানের পথদ্রষ্টা ছিলেন। যে-কারণে '৪৬ সালের এপ্রিলে দিল্লি মুসলিম লেজিসলেটরস কনফারেন্সে তার নির্দেশে এবং সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় লাহোর প্রস্তাবে 'স্টেটস' শব্দটি 'স্টেট' হয়ে যায়। যার মধ্য দিয়ে দুই পাকিস্তান হয়ে গিয়েছিল এক পাকিস্তান। যদিও জিন্নাহর মৃত্যুর আগে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের কাছে সিদ্ধান্তটি ভুল বলে স্বীকার করে গেছেন। তবে তখন আর শোধরানোর উপায় ছিল না। আর উত্তরসূরিরা সে ভুলকে ধরে রেখে পাকিস্তান পরিচালনা করার জন্য '৭১-এর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে (হোসেন, ২০২৪, পৃ. ১-২)।

১৯৬০ সালে 'জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ধারণ অধিকার' বিষয়টি একটি মানবাধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনি দলিলে স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও এ বিষয়টি তার পূর্বের কয়েক দশকে সারাবিশ্বে অধিকার অর্জনের মতো

পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল। এ দলিলটি ছিল 'Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (DGICCP)'। উক্ত আইনি দলিল অনুসারে কোনো ভাষাভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আত্মনির্ধারণ অধিকার চর্চার যোগ্যতা রাখে। যে-কারণে দেখা যায়, হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বিকাশমান বাঙালি জাতি বা বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী ১৯৪৭ সাল হতে যখন ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করা বাঙালি জাতীয় স্পৃহা তৈরির মাধ্যমে 'আত্মনির্ধারণ অধিকার' চর্চার দিকে অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যায়, তখন থেকে উক্ত বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনে আবৃত একটি বিষয় বলে পরিগণিত হয় (মন্ডল, ২০২৩)।

**ভাষা আন্দোলনে নিহতদের পক্ষে মামলা**

১৯৫২ সালের ২৫শে মার্চ শহিদ আবুল বরকতের ছোটো ভাই আবুল হাসনাত ঢাকা সদর মহকুমা হাকিম এন. আহমদের এজলাসে একটি মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন। আবুল বরকতকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধে তিনি ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশী, সিটি এস.পি মাসুদ মাহমুদ, ডি.আই.জি. এ. জেড ওবায়দুল্লা ও কয়েকজন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। আবেদনে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ এম.এ ক্লাসের ছাত্র আবুল বরকত ২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে তার বন্ধু মোরশেদ নেওয়াজের সাথে দেখা করতে যান। মোরশেদ নেওয়াজ ১২ নং শেডের একটি ঘরে থাকতেন। সেখানে উভয়ের সাক্ষাতের সময় বাইরে বিভিন্ন স্লোগান হচ্ছিল। যা শুনে বরকত শেডের বাইরে এসে দাঁড়ান এবং কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশকে হোস্টেলের ভেতর প্রবেশ করতে দেখে আবার ঘরে ফিরে যাবার সময় পুলিশের গুলিতে পড়ে যান। তাকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলে ডা. নুরুল হক তার চিকিৎসা করান। আহত অবস্থায় বরকত হাসপাতালে কর্তব্যরত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট তার আঘাতের বিবরণ দেন এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ওই আঘাতের ফলে তিনি মারা যান। পুলিশ আবেদনকারীর অনুরোধ উপেক্ষা করে মৃতের আত্মীয়-স্বজনের আগমনের অপেক্ষা না করে ও ময়নাতদন্ত না করে সে-রাতে লাশ দাফন করে। মহকুমা হাকিম বিচারের জন্য মামলা গ্রহণ করতেই রাজি হন না। তিনি বলেছিলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই সরকারি অফিসার। ঘটনার আগের দিন যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল তা কার্যকর করতেই তারা ঘটনার সময় কর্তব্যে নিযুক্ত ছিলেন। অভিযোগের বিবরণ অনুযায়ী তারা যা কিছু করেছেন তা নিজ নিজ কর্তব্য হিসেবে করেছেন। একই সাথে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৩৭ ও ১৩২ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা যায় না। আবেদনকারী তার অভিযোগের সাথে অনুরূপ কোনো অনুমতিপত্র দাখিল করতে পারেননি বলে অভিযোগটি খারিজ করা হয় (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ২২)। মামলাটি আবেদনকারীর পক্ষে পরিচালনা করেন আলী আমজাদ খান, আতাউর রহমান খান, এম. রহিম, কামরুদ্দিন আহমদ, জমিরুদ্দিন, নুরুল ইসলাম, জহিরুদ্দিন, সৈয়দ শহুদুল হক ও শামসুল হক। আর কোর্ট ইন্সপেক্টর কাজী জহুরুল হক সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রফিকউদ্দিন আহমেদকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধে ঢাকার জেলা মেজিস্ট্রেট জনাব কোরেশী, সিটি এস,পি জনাব মাসুদ মাহবুব, ডি, আই, জি, জনাব এ, জেড, ওবায়দুল্লাহ ও জন কয়েক অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারী পুলিশের বিরুদ্ধে ২৮শে মার্চ শুক্রবার ঢাকা সদর মহকুমা জনাব এস, আহমেদের এজলাসে অভিযোগ করা হলে তা বাতিল করা হয়। মহকুমা হাকিম বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই সরকারি কর্মচারী। একইসাথে যেহেতু তারা নিজ নিজ কর্তব্যে

নিযুক্ত থাকাকালীন গুলিবর্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে-কারণে সরকারের অনুমোদন ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে বিচারার্থ কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা চলে না। মৃত রফিকউদ্দিন আহমদের মামাত ভাই জনাব মোশাররফ হোসেন খান উপরিউক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ঘটনার বিবরণে সে-দিন বন্দুকধারী পুলিশকে প্রহরারত দেখতে পাওয়া যায়নি। একদল পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে প্রবেশ করে গুলিবর্ষণ করে এবং সেই গুলিতে রফিক নিহত হন। তাছাড়া, আবেদনকারী এটিও উল্লেখ করেন যে পুনঃপুন অনুরোধ করার পরও পুলিশ মৃত রফিকউদ্দিনের পিতার আগমনের অপেক্ষা না করে সে-দিন রাত প্রায় ৩টার দিকে আজিমপুরে মৃতের লাশ দাফন করে। বাদী পক্ষে জনাব আতাউর রহমান, জনাব জহিরুদ্দিন, জনাব জমিরুদ্দিন, জনাব এস, এ রহিম প্রমুখ এবং বিবাদী পক্ষে কোর্ট ইন্সপেক্টর জনাব কাজী জহুরুল হক মামলা পরিচালনা করেন (স্টাফ রিপোর্টার, ১৯৫২)। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মওলানা ভাসানী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে গুলি চালানোর জন্য সরকারের নিকট তদন্ত দাবি করে। তিনি উল্লেখ করেন উক্ত গুলি চালনায় ৭ ব্যক্তি শহিদ হয়েছিলেন, তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট তথ্য তার কাছে রয়েছে। একইসাথে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলি চালানো নিয়ে নতুন তদন্ত করার দাবি আসে।

১৫ই মার্চ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন পূর্ব-বাংলা সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী তদন্তের জন্য বিচারপতি টি. এইচ. এলিস-কে নিয়োগ করেন। সরকার শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারির গুলি চালানোর ঘটনার মধ্যে তদন্তের এখতিয়ার বেঁধে দেয়। জনসাধারণ তদন্তের এ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে। কমিশনের কর্মপরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় ভাষা আন্দেলনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তা প্রত্যাখ্যান করে। অনেক ছাত্র বন্দি ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ায় অনেকে সাক্ষ্য দিতে পারেনি। তদন্তে শুধু গুলির বিষয়টি আনা হয়, সামগ্রিক ঘটনাবলিকে সংযুক্ত করা হয়নি। তদন্ত কমিশনকে প্রহসন আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন সংগঠন দাবি জানাতে থাকে। ঢাকায় কমিশনার্স কোর্টে ১৯৫২ সালের আট এপ্রিল বিচারপতি এলিস তদন্ত শুরু করেন। ৩রা মে শুনানির দিন শেষ হয় ও ২৭শে মে সরকারকে তদন্ত-রিপোর্ট দেওয়া হয়। ৩১শে মে তা প্রকাশ করা হয়। তদন্তে বিচারপতি এলিস দেখানোর চেষ্টা করেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় পুলিশের গুলিবর্ষণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে। আইনত সরকারের তরফ হতে কোন অংশগ্রহণ ছিল না। তবে ঢাকা হাইকোর্টের সৈয়দ আব্দুল গণিকে সাহয্যের জন্য বলেন। রিপোর্টে ৯১ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় ১৪৪ ধারা অমান্যের জন্য। বেলা ৩টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না নিতে পেরে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল এবং পুলিশ সুপার গুলি চালানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ও পুলিশ সুপারের সরাসরি আদেশক্রমে পুলিশ দাঙ্গাকারীদের উপর গুলি করতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না থাকায় কতজন নিহত হয় পুলিশ সঠিক তথ্য জানে না। পরবর্তীতে রিপোর্টে দেখা যায় হতাহতের সংখ্যা ৯ জন ও তাদের মধ্যে ২ জন রাত্রে মারা যান। বিচারপতি জানান, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নতুন। তিনি আরও জানান, সব লিখিত ও মৌখিক তথ্য হতে জানা যায়, সেদিন ২৭ রাউন্ড গুলি হয়, গুলিতে ৯ জন আহত ৩ জন মারা যায়। আরও জানান, পুলিশের পক্ষে গুলি চালানোর প্রয়োজন ছিল আর পরিস্থিতির বিবেচনায় গুলি করা যুক্তিযুক্ত ছিল। উক্ত তদন্তে বিচার্য বিষয়ের পরিধি ছিল যুক্তিযুক্ত (হেলাল, ২০০৩, পৃ. ১৪২-১৪৯)।

**জনগণের সম্পৃক্ততা**

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাপ্রসূত ও সংশ্লিষ্ট আন্দোলন ছিল না। এখানে নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। যার ধারাবাহিকতায় আত্মপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন সংগঠনের। বিভিন্ন শ্রেণি-

পেশার মানুষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ধারণা হতে পারে, ভাষার ব্যাপারটা শিক্ষিত লোকদের বিষয়। তবে ভাষাটা শিক্ষিত লোকের চেয়ে গরিবদের বেশি দরকার ছিল। শিক্ষিত যারা ছিলেন, তারা তো ইংরেজি কিছুটা জানতেন। বাংলা তাদের না জানলেও হতো। কিন্তু যারা গরিব, তাদের তো বাংলা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কাজেই নিজের ভাষায় কথা বলতে পারবে না এ বিষয়টি এবং তৎকালীন দুর্ভিক্ষ ও খ্যাদ্যাভাব সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে প্রভাবিত করে (উমর, ২০২৪, পৃ. ৫)। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্ররাই মূলত বিক্ষোভ শুরু করলেও পরবর্তীতে সে বিক্ষোভে অফিস-আদালতের কর্মচারী এবং রেল-শ্রমিকরা যুক্ত হয়েছিল (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৬)। 'আসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেন, ১১-১৫ই মার্চ নেতারা কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন:

> দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে শ্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করতো। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশের জুলুম চলবে না'– নানা ধরনের শ্লোগান দিত। এ সময় হক সাহেবকে আমি বললাম, ''হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।'' হক সাহেব আমাকে বললেন, ''তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব'' (রহমান, ২০১২, পৃ. ৯৩, ৯৫)।

পঞ্চাশের দশকে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এদেশের মেয়েরা রক্ষণশীলতার বেড়ি ভেঙে একটা প্রগতির ধারা সূচনা করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাসের অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ স্মৃতিচারণ করেছেন:

> ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করার সময় শুরুর দিকে দুই তিনটি দলে ভাগ হয়ে ছাত্রদের মিছিল বেরিয়ে যাওয়ার পর ছাত্রীদের যে মিছিল হয় তাতে তারা আট-দশ জনের মত ছিলেন। রক্ষণশীল পর্দাপ্রথা মেনে চলা মেয়রাও ভাষা আন্দোলন অনিবার্য দেখে বোরখা পরেই মিছিলে গিয়েছিল ও গুলি ও কাঁদনে গ্যাসের সম্মুখীন হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরাও এ সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে আন্দোলন পরিচালনার জন্য। চার দশক আগে নারীদের পক্ষে রক্ষণশীলতার দড়ি ছেড়া ততটা সহজ ছিল না। তার মধ্যেও মেয়েরা নানা ভাবে ভাষা আন্দোলনকে শক্তি, অনুপ্রেরণা দিয়েছিল (হোসেন, ২০২৪,পৃ. ২৪ )।

সংগঠন হিসেবে 'ইউথ লীগ'-ই ভাষা আন্দোলনের মূল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জের মর্গ্যান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ২১শে ফেব্রুয়ারির পর ঢাকায় গুলি করে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে মুখরিত হয় নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জের রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউটের মাঠে বিশাল প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে অনেক মহিলা ও মর্গ্যান স্কুলের ছাত্রীরা এতে অংশ নেয়। এ সভায় আদমজী জুটমিলের হাজার হাজার শ্রমিক অংশ নেয় (শাহনেওয়াজ, ২০১৭, পৃ.১২৮)। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের সাথে জনগণ পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুড়েছিল। ছাত্রদের সাথে এ-দিন যুক্ত হয়েছিল এলাকার রেস্টুরেন্ট বয়, অফিসের পিয়ন, কর্মচারী, রিকশাওয়ালারা। ছাত্রদের সাথে বয় বাবুর্চিরা ইট ভেঙ্গে জমা করে রাখছিল যাতে পুলিশ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষা বাংলার মান রাখতে প্রাণ দিচ্ছে শুনে স্রোতের মতো মানুষ ছুটে আসে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দিকে। আহতদের খবর নেওয়াসহ তাদের প্রাণ

রক্ষায় ছাত্রদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রক্ত দিয়েছিল সাধারণ জনগণ। মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের রোগীরা রাস্তার দিকের করিডরে দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা দেখছিল। তাদের মধ্যে অনেকে আবার পুলিশের দিকে কিছু না কিছু নিক্ষেপ করছিল (আনিসুজ্জামান, ২০০৩)। সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, এস এম হল হতে বক্তৃতা করছে, ক'দিন তারা যা বলছে জনগণ তা ই শুনছে, মানছে তাদের নির্দেশনা, যেন তারাই সরকার। ২২শে ফেব্রুয়ারিতে নিহত হওয়া শফিউর রহমানের স্ত্রী আকিলা খাতুনের সাক্ষাৎকারে জানা যায়, ২১শে ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান বাসায় ফিরে সবাইকে বলেছিলেন তিনি এ-দেশে আর থাকবেন না। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি সেদিন তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। সে-সাথে বলেছিলেন, সভ্য দেশে পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পা লক্ষ্য করে গুলি করে। কিন্তু আজ পুলিশ এলোপাতাড়িভাবে গুলি চালিয়ে ছাত্রদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। কী বর্বরতা (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৬৫)! যার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের শাসকদের প্রতি তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

২২শে ফেব্রুয়ারিতে গায়েবানা জানাজা হলে মর্মস্পর্শী ভাষায় ইমাম বলেছিলেন, ''হে আল্লাহ, যে জালেমরা আমাদের মাসুম বাচ্চাদের উপর গুলি চালিয়েছে, তাদের ধ্বংস করে দাও।'' গায়েবানা জানাজার পর অসংখ্য মানুষ শোক-মিছিলে অংশ নেয়। ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন উল্লেখ করেন, ২২ তারিখে মিছিল বের করা সম্ভব হয়েছিল বিপুল পরিমাণে জনগণ জানাজায় অংশ নিয়েছিল বলে। সেক্রেটারিয়েট থেকে জানাজায় অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বিরাট মিছিল এসেছিল। অফিসের বড়ো সাহেবদের হুমকি ও ওয়ার্নিং সত্ত্বেও সেক্রেটারিয়েটের কেরানিরা ধর্মঘট করেছিল। এদের সাথে বহু-সংখ্যক অন্য লোকেরাও মিছিল ও জানাজায় অংশ নেয়। ভাষাসৈনিক মুস্তফা রওশন আখতার মুকুল-এর জবানিতে জানা যায়, জগনাথ হলের ছেলেরা, হকার্স মার্কেটের লোকেরা, ঢাকার স্থানীয় মানুষ ঢাকার সদরঘাট এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন। গায়েবানা জানাজায় জিঞ্জিরা, ফতুল্লা, মিরপুর, সাভার, বাড্ডা প্রভৃতি জায়গা হতে দলে দলে লোক এসেছিল (হেলাল, ১৯৮৫, পৃ. ৪২৮-২৯)। পরবর্তীকালে ঢাকায় কারফিউ জারি হয়। নেতারা ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। আবুল বরকত যেখানে শহিদ হন, সে-স্থানে ছাত্ররা ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে কারফিউ অমান্য করে শহিদ মিনার গড়ে তোলে। অনেক মানুষ সেখানে এসে অশ্রু ফেলে, টাকা পয়সা দেয়, এমনকি অনেক মেয়েরা অলঙ্কার রেখে যায় (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ১৪)। ২৩শে ফেব্রুয়ারি সকালে সংবাদপত্রে আসে ৫ জন নিহত ১২৫ জন আহত ও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। প্রদেশের সর্বত্র ঢাকার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সংগঠিত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় (রহমান, ২০১৬, পৃ. ১৪৬)। সরকার-পক্ষ পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন মহল্লার সরদারদের মধ্যে ভাষা আন্দোলন-বিরোধী মনোভাব তৈরির চেষ্টা করে। তারা প্রচার চালায়, ভারতীয়দের অনুচর হিসেবে নাস্তিক কমিউনিস্টরা ভাষা আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করছে।

এভাবে মানুষের বিক্ষোভ সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগ হেরে যায়। ২রা এপ্রিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যদিও পাকিস্তান সরকার তিন মাসের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ৯২(ক) ধারা প্রবর্তন করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর হন ইস্কান্দার মীর্জা। ১৯৫৫ সালের ৩রা জুন ৯২(ক) ধারার গভর্নর কেন্দ্রীয় শাসন বাতিল হয়। তবে ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির শোক দিবস উদ্‌যাপনে সরকার বাধা দেয়। অনেক ছাত্র এ-সময় জেলে যায়। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষে আরমানিটোলা

ময়দানে এবং কৃষক প্রজা পার্টির তরফে পল্টন ময়দানে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আরমানিটোলা ময়দানের সভায় শুরুর আগে থেকেই সভাস্থল জনসমুদ্রে পূর্ণ হয়। ময়দানের পাশের রাস্তাগুলোতেও জায়গা না হওয়াতে বাড়ির ছাদ ও বারান্দায় অসংখ্য লোক শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে জনসভার বক্তৃতা শোনেন। শেষে এক বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। সে মিছিলের ওপর পথের উভয় পাশের বাড়ির ছাদ ও বারান্দা হতে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। ঘরে ঘরে কালো পতাকা উত্তোলন, শহিদদের সংগ্রাম ও আদর্শের উত্তরাধিকারী ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীরা বাহুতে কালো ব্যাজ ধারণ, নগ্নপদে শোকপ্রকাশ, শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসসমূহের সামনে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, অশ্রু-সজল চোখে দলে দলে জনগণ শহিদদের কবর জিয়ারত ও শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং পূর্ণ হরতালের মধ্য দিয়ে ১৯৫৬ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সেদিন বাংলা একাডেমির দায়িত্ব বাংলা ভাষার প্রতি সহানুভূতিশীল নন এমন সব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করায় জনসাধারণের দাবির প্রতি পূর্ববঙ্গ-সরকার উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে বলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভা হতে তীব্র নিন্দা জানানো হয়। একইসাথে সকল কালা-কানুন বাতিলসহ সকল রাজবন্দিদের অবিলম্বে মুক্তির কথা বলা হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আন্দেলন চলে এবং সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়। এর মধ্য দিয়েই বাঙালি সাধারণ জনগণের মধ্যে জাতীয়তার চেতনা জাগ্রত হয় এবং ক্রমে তা ১৯৭১ সালে গিয়ে পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

**আইনগত প্রতিরোধ**

পাকিস্তান রাষ্ট্রের উর্দুর অধিপত্য এবং অন্যান্য ভাষার প্রতি পদ্ধতিগত অবহেলা এ অঞ্চলের মানুষকে একইসাথে মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট এবং আন্দোলনে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালন ও সেক্রেটারিয়েট ঘেরাও করা হলে একদিকে পুলিশের বেটন, বেয়নেট, বুট দ্বারা আন্দেলনকারীদের আঘাত করা হয়। অনেক ছাত্র আহত হন এবং জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এ-সময় কয়েকশজন গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গিয়েছিলেন (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৬)। কমিউনিস্ট পার্টিসহ সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিরোধী-দলকে দমন করতে সরকার জননিরাপত্তামূলক আইনসহ অন্যান্য বহু নির্যাতনমূলক আইন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সংবাদপত্রের উপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক সম্পাদকীয় ও সংবাদ প্রকাশের ওপর সেন্সরশিপ জারি করেন। দৈনিক *পূর্ব পাকিস্তান*, *ইস্টার্ণ স্টার*-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হতে এ সেন্সর উঠিয়ে দেওয়ার আবেদন আসে (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ২৪৫-২৪৮)। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে নূরুল আমীন সরকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য আগের দিন ১৪৪ ধারা জারি করেন। এ আইনে বলা হয়, একইসাথে চারজনের বেশি রাস্তায় নামা যাবে না ও কোনো সভা-সমাবেশ-মিছিল করা যাবে না। উক্ত আইন ভঙ্গ করলে জেল, জরিমানা হতে পারে। এ-দিন এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা আইন অমান্য করা শুরু করে। পুলিশ তাদের ধরে গাড়িতে নিতে শুরু করলে কে আগে যাবে তা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। সত্যাগ্রহীদের অনেককে পুলিশ ঢাকার বাইরে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে তখন পুলিশ আইন-অমান্যকারী সত্যাগ্রহীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায়। মেয়েদেরকেও এ-সময় আঘাত করা হয়। কাঁদানে-গ্যাসের শেল ছাড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে। ছাত্র-জনতার প্রতিরোধে টিকতে না পেরে তখন পুলিশ গুলি ছোড়ে রাস্তাসহ মেডিক্যাল কলেজের ভেতরে। শহিদ হন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের আই কম-এর ছাত্র রফিকউদ্দিন আহমেদ, রিকশাচালক আবদুল জব্বার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ-এর ছাত্র

আবুল বরকত। অনেকে আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে। যাদের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগের পিয়ন আবদুস সালাম ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে তিনটায় মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে আহত হন। ১৯৫২ সালের ৭ই এপ্রিল বেলা সাড়ে এগারটায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরবর্তীতে তিনি মারা যান। সাপ্তাহিক '*নতুন দিন*'র ১৩৬২ সালের ১১ই ফাল্গুন সংখ্যায় অহিউল্লাহ নামে আট-নয় বছরের এক কিশোরও শহিদ হন বলে উল্লেখ করা হয় (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৮২)। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী আবদুল আওয়াল নামের ২৬ বছর বয়সি একজন রিক্সাচালক ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২-তে শহিদ হন।

শহিদ রফিকের ভগ্নীপতি মোবারক আলী খানের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ বিবৃতির মাধ্যমে রচিত এক লেখায় উল্লেখ আছে, ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ২টার সময় জানা যায় মেডিকেলে গুলি চলেছে এবং তিনজন ছাত্র মারা গেছে। বেলা তিনটায় ফুলবাড়িয়া রেলগেট এবং নওয়াবপুরে গোলাগুলি চলেছে। রেলগেটে ছোটো একটা শিশু গুলিতে মারা গেছে। এভাবেই চারদিক হতে গোলাগুলির সংবাদ জানা যায়। এছাড়া তিনি ইমারর্জেন্সি ওয়ার্ডে জনৈক কর্মরত ডাক্তারের নিকট জানতে পারেন যে, ৪টি লাশ রয়েছে হাসপাতালে (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৪৮)। ২২শে ফেব্রুয়ারিতেও গুলি চলে। সকাল সাড়ে দশটার দিকে নবাবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিলকারীদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এ-দিন শফিউর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হলে সন্ধ্যা সাতটায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেডিক্যাল কলেজ হতে লাশ নিয়ে গুম করে ফেলত। কারণ লাশ দেওয়া হলে ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করবে ও পরিস্থিতি খারাপ হবে। পূর্ব-রাত্রে মর্গ থেকে সব লাশ সরিয়ে গায়েব করে দেওয়া হয়। যে কারণে গায়েবানা জানাজা করা হয়। এরপর শোক মিছিলেও শহরের নানা জায়গায় গুলি চলে, এমনকি বেয়নেটও চার্জ করা হয়। পাকিস্তান পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসে কর্মরত সুপারিনটেনডেন্ট শফিউর রহমান এ-দিন শহিদ হন। নাম না জানা অনেকে শহিদ হন, তবে পুলিশ লাশ গুম করে ফেলে। গোপনে পুলিশ আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে কয়েকজন শহিদের লাশ কবর দেয়। ২১ আর ২২শে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের অভ্যন্তরে অনেক আলোচনা, বিক্ষোভ, বিতর্ক চলতে থাকে। সদস্যরা ছাত্র হত্যার তদন্ত আর অপরাধীদের বিচার দাবি করেন। এ বিতর্কের মধ্যেও তারা বাংলা ভাষার দাবি তোলেন। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হলেও শুধু বাংলা ভাষাকে বাঙালিরা রাষ্ট্রভাষা করতে চায়নি। তারা চেয়েছিল বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্র ভাষা করা হোক। তবে বাঙালির এ উদারতাটাই অনেকে দুর্বলতা হিসেবে গ্রহণ করেছে (মুজিব, ২০১২, পৃ. ১৯৮)।

**ভাষা আন্দোলন পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ**

ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সাল হতে। ভাষা আন্দোলনের আলোকে বর্তমান বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে, ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখা ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। সংবিধান ও আইনে রাষ্ট্রভাষা বাংলা সর্বস্তরে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা প্রতিপালন হচ্ছে না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি ২১ দফার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে। ১৯৫৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। সেসাথে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবেও স্বীকৃতি দেয় (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৯৪)। ডাকসুর সহ-

সভাপতি জনাব ফেরদৌস কোরেশীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। ভাষণদানকালে জনাব ফেরদৌস আহমদ কোরেশী অভিযোগের সুরে বলেন, এখনও অফিস আদালতে বাংলা ভাষা কেন চালু করা যাচ্ছে না তা সরকারের কাছে মানুষের জিজ্ঞাসা (আজাদ, ১৯৬৭)। জাতীয় জীবনে বাংলা ভাষা চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো আদালত। তবে সেখানে এখনও ইংরেজিই চর্চা হয়ে থাকে। নিম্ন আদালতের রায় বাংলায় দেওয়া হলেও উচ্চ আদালতের রায় দেওয়া হয় ইংরেজিতে। কয়েকজন বিচারপতি সাম্প্রতিককালে উচ্চ আদালতের রায় বাংলায় দিয়েছেন। এ রায় দেওয়ার বিষয় নিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রবন্ধ লিখেছেন। সাবেক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান লিখেছেন, 'দেশের রায় বাংলায় লিখতে হবে, যাতে নিরক্ষরও শুনলে কিছু বুঝতে পারে। বিদেশীদের অসুবিধা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সব সন্দেহ নিরসনকল্পে সংসদেও দ্ব্যর্থহীন উদ্যোগ নেওয়া উচিত' (*প্রথম আলো*, ২০১৩, পৃ. ১, ৬)। সাবেক বিচারপতি কাজী এবাদুল হক আদালতে বাংলা ব্যবহারের বাধা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। তিনি নিজেও কয়েকটি রায় বাংলায় দিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, বিচারপতিদের মধ্যে একমাত্র প্রয়াত আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বাংলা ভাষায় আদেশ দান ও রায় লেখা শুরু করে সবাইকে পথ দেখিয়েছেন।

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োগে কিছু সীমবদ্ধতা আছে তবে সংবিধান বা প্রচলিত আইনে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা আছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এ ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতেই ৮ই মার্চ ১৯৮৭ সালে প্রণীত হয় 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন'। এর মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। সংবিধানের ধারা ৩(১) এ বলা হয়েছে, বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সবক্ষেত্রে নথি-চিঠিপত্র, আইন-আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগ কার্যাবলি অবশ্যই বাংলায় লিখতে হবে। এ বাধ্যবাধকতা উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ মতে 'আদালত অর্থ সুপ্রিমকোর্টসহ যে-কোন আদালত' (সংবিধান, ১৯৭২)। ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭(২) ধারা এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারা সরকারকে আদালতের ভাষা নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছে। তবে ১৯৮৭ সালের আইনের ৩(১) ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা সরকারকে এ দায় হতে অব্যাহতি দিয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় মৌলিক মানবাধিকার ও সুবিচারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এর ৩৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রকাশ্য বিচার লাভ' ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। আর ইংরেজি না জানা বা না বোঝা ব্যক্তির কাছে 'প্রকাশ্য বিচার আর গোপন বিচার'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। বিচারপ্রার্থী জনগণের অবশ্যই রায় অনুধাবনের সুযোগ থাকতে হবে। এছাড়া, বিচার পাওয়ার অধিকারকে সমুন্নত ও সুসংহত রাখতে আদালত বা বিচারিক প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। ভাষার দুর্বোধ্যতা বিচারপ্রার্থী জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার হলো বোধগম্য ভাষায় বিচার লাভ করা। জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর) এর ১৪(৩) ধারায় বলা হয়েছে, 'কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হলে সে অভিযোগের প্রকৃতি ও কারণ দ্রুত ও বিস্তারিতভাবে সে বোঝে এমন ভাষায় তাকে জানাতে হবে। আদালতের ব্যবহৃত ভাষা যদি সে বুঝতে বা বলতে না পারে, তবে তাকে বিনামূল্যে দোভাষী দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।' বাংলাদেশ উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও পালন বা কার্যকর করার পরিপূর্ণ আগ্রহ নেই। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের ১(২) ধারায়

আইনটি 'অবিলম্বে বলবৎ হইবে' বলে উল্লেখ আছে। ৩(২) ধারায় বলা আছে, কর্মরত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষায় আবেদন বা আপিল করলে তা বেআইনি ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে। আর ৩(৩) ধারায় বলা হয়, কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এ আইন অমান্য করলে তা হবে অসদাচরণ। যে-কারণে তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি' অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বাস্তবে 'অবিলম্বে বলবৎ হইবে' নির্দেশনাটি কার্যকর হয়নি। এ আইনের ৪ ধারায় বাংলা প্রচলনে প্রয়োজনে সরকারকে বিধি প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। এ ধারাটিও কার্যকর হয়নি। সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদ-এ বলা হয়, 'রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাগুলোর এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।' উচ্চ আদালত এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাতে পেরেছে।

২০১২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ও ২০১৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের বিষয়ে এবং বেতার টেলিভিশনে বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণ ও দূষণরোধে রুলসহ নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট। যাতে বেতার ও টেলিভিশনে বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণ এবং ভাষা ব্যঙ্গ ও দূষণ করে অনুষ্ঠান প্রচার না করার নির্দেশনা ছিল। সাথে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও বিজ্ঞাপন, গাড়ির নম্বরপ্লেট, সব সাইনবোর্ড ও নামফলক বাংলায় লেখার নির্দেশ আসে। সে-সাথে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭' অনুসারে সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে বাংলা চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্ন আদালতে ইংরেজি লেখা বা বলার জন্য কোনো কিছুকে 'বেআইনি' বা অকার্যকর' ঘোষণা করা না হলেও সেখানে আরজি, আবেদন, আপিল লেখা, সাক্ষ্যগ্রহণ, জেরা, সওয়াল-জবাব, যুক্তি তর্ক উপস্থাপন, রায় লেখাসহ সমগ্র বিচার-ব্যবস্থায় বাংলার আধিক্য বেশি। বাংলা ভাষায় রায় লেখা নিয়ে বিচারপতি খায়রুল হক বলেছেন, ''সাধারণ মানুষ যাতে এ রায়ের বিষয়বস্তু বুঝতে পারেন। এ নিয়ে চায়ের দোকানে, চুলার পাশে বসেও যাতে আলোচনা করতে পারেন।'' এ বিষয়ে সাবেক বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেছেন, ''ন্যায়বিচার যদি সদ্‌গুণ হয় এবং জনগণের কল্যাণই যদি এর কাজ হয়, তবে তা জনগণের ভাষাতেই হওয়া উচিত।'' সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা তার কার্যকালীন উচ্চ আদালতে বাংলায় রায় লেখা ব্যাপকভাবে প্রচলনের আশ্বাস দেন এবং অবসরে যাওয়ার আগে সব রায় বাংলায় দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন (ছিদ্দিকী, ২০২৪, পৃ. ৩)। অনুবাদ-জটিলতা, দক্ষ অনুবাদক বা যথেষ্ট পরিভাষা নেই বলে এসব ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। তবে সদিচ্ছার মাধ্যমে শীঘ্রই উচ্চ আদালতের ভাষা জনগণের ভাষা হয়ে উঠবে। তবে বাংলা ভাষা প্রয়োগের আইন থাকলেও সামগ্রিকভাবে আইনের এ নির্দেশ সাতাশ (২০২৪) বছর পরেও যথাযথভাবে পালন করা হয় না। ২০২২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে দৈনিক ভোরের কাগজের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ভাষা আন্দোলনের ৭০ বছর আর বিজয়ের ৫০ বছর পরও ভাষানীতি না হওয়ায়... হারিয়ে যাচ্ছে প্রমিত বাংলা। স্বপ্নই রয়ে গেছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর স্বপ্ন' (ভোরের কাগজ, ২০২২, পৃ.১)। এ বিষয়ে সরকারি উদ্যোগও সীমিত। এরশাদ-সরকার এবং পরবর্তী সরকারগুলোর আচরণে দেখা যায় 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭' প্রহসনে পরিণত হয়েছে। মূলত সাধারণ মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন এবং দেশে স্থিতিশীল কল্যাণকামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু না হলে এ ধরনের আইন কার্যকর করা সম্ভব হবে না। এর জন্য বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও উপলব্ধি প্রয়োজন।

**গবেষণার ফলাফল**

ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার জন্য আন্দোলনই ছিল না, এ আন্দোলনের ছিল বহু মাত্রা। মহান একুশের চেতনায় জাগ্রত বাংলার মানুষ অতীতের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে আরও বেগবান করবে একুশের চেতনা মূলত এটিই। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর হতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে সংগঠিত সব আন্দোলন ছিল গণমানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকার সব সমাবেশ বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও ছাত্ররা মায়ের ভাষা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাকে বৈষম্যবাদ আখ্যা দিয়ে সরকারি আদেশ প্রত্যাখ্যান করে। রাষ্ট্রের ভাষা বাংলা, রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার ব্যবহার থেকে বিরত থাকাও যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তবে বাস্তবতা হলো ইংরেজি ভালো না জানলে শুধু বাংলা দিয়ে বর্তমানে এ-দেশের মানুষ খুব বেশি এগিয়ে যেতে পারছে না। রাষ্ট্রভাষা বাংলার ব্যবহার আইন আদালতে করার বিষয়টি শুধু সাংবিধানিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা না, এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্গত। ২০১২ সালে হাইকোর্ট রুলস চালু হওয়ার ৩৯ বছর পর এবং বাংলা ভাষা আইন প্রচলনের ২৫ বছর পর হাইকোর্টে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় দরখাস্ত করার বিধান যুক্ত হয়। যার ভিত্তিতে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের দাবিতে ইউনুস আলী আকন্দ নামে এক আইনজীবী রিট করেন। উক্ত আবেদনটি ছিল বাংলায়। সম্প্রতি বাংলায় রায় আদেশ লেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের 'বাংলা সংস্করণ' চালু হয়। সে-সাথে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে প্রকাশিত সব রায় ও আদেশ গুগল প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলায় অনুবাদ করে পড়ার সুযোগ আছে। হাইকোর্টে পূর্বের তুলনায় বাংলায় নোটিশ ও আদেশ প্রদানের ঘটনা খুব বেশি। তবে উচ্চ আদালতে বাংলা চর্চার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা রায় লেখা। স্বল্প-সংখ্যক বিচারক রায় বাংলায় লিখলেও তা অল্প সময়ের জন্য। আইনের ভাষা এবং উচ্চতর ডিগ্রির পাঠ্যবই এখনও ইংরেজি ভাষায় রয়েছে।

মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে নিজেদের উৎসর্গ করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতিকে এক ঐতিহাসিক ও বীরোচিত মর্যাদা দিয়েছে। যে কারণে বাঙালির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, অধিকার, সংগ্রাম ও ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এ ঘোষণার পর হতে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সারা বিশ্ব দিবসটি উদ্‌যাপন করে। কথা বলার ভাষা এবং একইসাথে স্বাধিকার কেড়ে নেওয়ার নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন, ত্যাগের ইতিহাস সৃষ্টির গৌরব শুধু বাঙালি জাতিরই আছে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে এক জাতির ভাষার প্রতি অন্য জাতির ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনে দায়িত্বের বিষয়টি স্মরণ করায়। একুশে ফেব্রুয়ারি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনার বিষয়টিকে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে সামনে নিয়ে আসে। যা জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিকাশের চেতনা জাগ্রত করে।

**উপসংহার**

একুশে ফেব্রুয়ারি এ দেশের মানুষকে শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মন্ত্র, বাঙালিকে করেছে মহীয়ান। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে এসেছে মহান স্বাধীনতা। জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নতির সাথে ভাষার উন্নতি কিংবা ভাষার উন্নতির সাথে জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নতি অবিচ্ছেদ্য। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভব বিস্তার করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে।

১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া ধারাবাহিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে এসে এক দৃঢ় অসাম্প্রদায়িক ঐক্যচেতনার জন্ম দিয়েছিল। এ ঐক্যশক্তি সময়ের প্রয়োজনে স্বাধীনতার জন্য কাজে লেগেছিল তবে বাংলা ভাষার উন্নয়নে তা ব্যবহৃত হয়নি। ভাষা আন্দোলনের চেতনার ধারাবাহিকতা ক্রমাগত পিছু হটছে। যার ধারাবাহিকতায় স্বাধিকার আন্দোলন ও সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রজুড়ে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চরম আকার ধারণ করছে। তাই সমষ্টিগত উন্নতি সমাজে তেমনভাবে দেখা যাচ্ছে না। এসব আত্মকেন্দ্রিকতার অবসান ঘটিয়ে সমষ্টিগত মানুষের মুক্তির মধ্য দিয়েই আমাদের সমষ্টিগত মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি সর্বজনীন হতে পারবে। ভাষাগত বৈচিত্র্যের সযত্ন লালন ও সুরক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, যাতে ভাষার কারণে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি না হয়। মাতৃভাষা সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, চর্চা, বিকাশ, প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধরে রাখাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

**তথ্যসূত্র**


আনিসুজ্জামান (২০০৩)। *কালনিরবধি*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

আল্ হেলাল, বশীর (২০০৩)। *ভাষা আন্দোলনের সেই মোহনায়*। ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনী।

আল্ হেলাল, বশীর (২০১০)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

*একুশ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বীরত্বগাথা: একটি সচিত্র ইতিহাস* (১৯৪৭-২০০৯)। ঢাকা: বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ফর ডেভেলেপমেন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ।

করিম, ফজলুল (২০১৪)। *বায়ান্ন'র কারাগার*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

কামাল, মোস্তফা (১৯৮৭)। *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*। ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.।

কুদ্দুস, গোলাম (২০১৫)। *ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: নালন্দা।

খান, শামসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.) (১৯৯১)। *ভাষা-আন্দোলনের শহীদেরা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২।

গুপ্ত, সন্তোষ (২০০৫), *একুশের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

চৌধুরী, নিগার। *বাংলার ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বাঙালির সংগ্রাম*। ঢাকা: ইছামতি প্রকাশনী।

বার্ণিক, এম.এ (২০০৫)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঘটনা প্রবাহ ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ*। ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

রহমান, হাসান হাফিজুর (২০১৬)। *একুশে ফেব্রুয়ারি*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

রহমান, আতিউর; আজাদ, লেনিন (১৯৯৫)। ভাষা আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

শাহনাওয়াজ, এ. কে. এম (২০১৭)। *ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও ইতিহাস*। ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।

সরকার, মোনায়েম (২০১৯)। *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

হক, ড. জাকিরুল (২০১৪)। *ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ দুই বাংলার চালচিত্র*। ঢাকা: গতিধারা।

হোসেন, ইসমাইল বকুল (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রক্তঝরা একুশ*। ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশনস।

R. J. Shafer (1974). *A Guide to Historical Method*. Illinois: Dorsey Press.

## সংবাদপত্র রিপোর্ট

আদালতে রাষ্ট্রভাষার প্রবেশাধিকার' (অমর একুশে ২০১৩)। ঢাকা: *প্রথম আলো*।

'একুশের অনুষ্ঠানে শহীদ সালামের পিতা' (২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭)। 'সমগ্র প্রদেশে শহীদ দিবস উদযাপিত, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার'। ঢাকা: *দৈনিক আজাদ*।

'ভাষা নীতি প্রণয়নের তাগিদ: প্রযুক্তিতে পিছিয়ে, উচ্চ শিক্ষায় অবহেলিত বাংলা ভাষা' (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২)। ঢাকা: দৈনিক ভোরের কাগজ।

'ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে আর একদফা মামলা'। ঢাকা: দৈনিক *আজাদ*।

## সাক্ষাৎকার

উমর, বদরুদ্দীন (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'বাংলা ভাষা গরিব মানুষের জন্য বেশি দরকার' (বিশেষ সাক্ষাৎকার)। ঢাকা: দৈনিক *প্রথম আলো*।

ছিদ্দিক, আফতাব উদ্দিন (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'উচ্চ আদালতে বাংলার পূর্ণাঙ্গ প্রচলনের প্রত্যাশা'। ঢাকা: দৈনিক *যুগান্তর*।

মন্ডল, শাহজাহান (২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)। 'ভাষা আন্দোলনের আইনি ভিত্তি'। ঢাকা: দৈনিক *জনকণ্ঠ*। Retrieved from *https://www.dailyjanakantha.com/opinion/news/678778*

হোসেন, সেলিনা (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'সংখ্যা মাত্র নয়'। ঢাকা: দৈনিক *জনকণ্ঠ*।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও বাস্তবতা'। ঢাকা: দৈনিক *ইত্তেফাক*।